বাতায়ন

রবীন্দ্রমানসে আলো ও অন্ধকার

কর্ণিকা সেন

বাইবেলে আছে, God said, "Let there be light. And there was light." সৃষ্টির সেই ঊষালগ্নে আলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। চিরন্তন এই আলোর পিপাসাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, বিশেষত তাঁর গানে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। নিজের সত্তায় তিনি আলোর স্পর্শ অনুভব করতেন। ভুবনজোড়া যে-আলো সে-আলো তো কবিরও চোখে। সে-আলোই তাঁর হৃদয় ভরিয়ে দেয়। সেই আলোর স্রোতেই বিশ্বচরাচর ভেসে যায়, প্রজাপতিরা পালতোলা নৌকার মতো ভেসে বেড়ায়, ফুলেরা আলোর নেশায় মাতাল হয়ে যায়। আকাশের মেঘ সেই আলোর ছোঁয়া পেয়ে মানিকের মতো জ্বলে, গাছের পাতা আনন্দে নেচে ওঠে। সেই আলো একান্তভাবে কবিরই। তার উৎস তাঁর প্রাণে। তাই তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন : ''আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবনভরা...।"

এই আলোর সুর কবির প্রাণে বেজে ওঠে। কেন তিনি জানেন না, কীসের নেশায় আনমনা হয়ে যান। আকাশ তাঁর মন কেড়ে নেয়, বাতাস কীসের আনন্দে তাঁকে ভরিয়ে দেয় কবি নিজেও তা জানেন না। শুধু এটুকু বুঝতে পারেন আকাশের শেষপ্রান্তে যে-আলোর ছায়া সেই আলো যেন তাঁর মনে ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। তার সৌরভ তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে যার দিকে তিনি সারাজীবন ধরে চেয়ে আছেন (গীতালি, ৫৬) :

''আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস করে
কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।
দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো।"

আকাশ থেকে আলোক-ঝরনা ঝরে পড়ছে— কবি প্রার্থনা করছেন সেই আলোয় তাঁর মন শুদ্ধ পবিত্র হোক, মনের সব মলিনতা মুছে যাক। রাজপুত্র যেমন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, ইংরেজি সাহিত্য, আর সি সি ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি

রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলেছিল, এই আলোর সোনার কাঠিও যেন ঠিক তেমন করে কবির মনের মাঝে যে ঘুমিয়ে আছে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এই আলোর স্পর্শে তাঁর জীবন যেন নতুন করে শুরু হয়। তাঁর মনের বীণায় অমৃতের মতো যে-গান ঘুমিয়ে আছে সে জেগে উঠুক। তার সুরের বন্যায় পৃথিবী ভেসে যাক। আর সেই পাগলকরা গানের সুরে তাঁর মন যেন নত হয়ে যায়। এই বিশ্বচরাচরে যে-সুরের স্রোত অবিশ্রান্ত বয়ে যাচ্ছে তার কাছে যেন তাঁর হৃদয়ও নত হয়।

''আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও।... বিশ্বহৃদয় হতে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাত হাওয়া,সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।''

আলোর সুর কবির মনকে ভরিয়ে দেয়। তাঁর গৃহের প্রাঙ্গণে তিনি যেন কোন অচেনা অতিথির পদধ্বনি শুনতে পান। আকাশ তাঁকে পৃথিবীর মাটি থেকে তুলে নিয়ে কোন অপার্থিব আনন্দময় জগতের সন্ধান দেয়। তাঁর হৃদয় ফুলের মতো সুগন্ধ ছড়িয়ে কাকে যেন খোঁজে। কবি আজীবন যে-পরমপুরুষকে খুঁজে এসেছেন, তাঁরই দূত হয়ে আলো যেন আজ কবির কাছে এসেছে।

আবার যখন নিজের মনের গভীরে ডুব দিয়ে কবি তার দেখা পেয়েছেন তখন আনন্দে গেয়ে উঠেছেন : ''আলো যে যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পুব-গগনে সোনার রেখা।''(গীতালি, ৫)

কবির মনের সব সংশয় কেটে গেছে। আকাশে সূর্য উঠলে যেমন সোনালি রেখা দেখা যায় কবির মনের আকাশেও আজ ঠিক তেমনই সোনালি রেখা। এ তাঁর হৃদয়দেবতার সঙ্গে মিলনের আলো।

দিশাহারা মানুষ অন্ধকার সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো ঘুরে বেড়ায়। তাদের সব পথ অন্ধকারে ঢাকা। যারা আলোর পিয়াসী তারাও আলো না পেয়ে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই ঈশ্বরের কাছে পৃথিবীর সব আলোর পিয়াসী মানুষের হয়ে প্রার্থনা করছেন :

''আলোকের পথে, প্রভু দাও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা।''
(আনুষ্ঠানিক সংগীত, ১৫)

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে কবি তাঁর হৃদয়দেবতার দেখা পেলেন। সেই মিলনের মুহূর্তে শুধু আলো আর আলো। আকাশে আলো, গাছের পাতায় আলো, পাখির বাসায় আলো। সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু আনন্দের আলো। তিনি যে 'আলোকময়' :

''আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।'' (গীতাঞ্জলি, ৪৫)

রবীন্দ্রনাথ আলোর সঙ্গে পদ্মফুলের মিল খুঁজে পেয়েছেন। পদ্ম ফুটলে তার সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। শরতের নীল আকাশের আলো কবির চোখে তাই 'আলোর অমল কমল'। তাঁর মনের সব ভাবনাই সেই আলোর কমলের পথে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। সরস্বতীর মতো শরৎরানিও সেই আলোর কমলবনে বীণা বাজান ললিত রাগে। শিউলি ফুল সেই রাগের মূর্ছনায় ঝরে পড়ে। কচি ধানের সবুজ খেতে বাতাস মেতে ওঠে। অরণ্যে প্রাণের হিল্লোল শোনা যায়। আলো আর প্রাণ রবীন্দ্রনাথের কাছে দুটি শব্দই সমান :

''আলোর অমল কমলখানি /কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।.../আমার মনের ভাবনাগুলি/ বাহির হল পাখা তুলি,/ওই কমলের পথে তাদের/সেই জুটালে।.../শরৎরাণীর বীণা বাজে/ কমলদলে।/ললিত রাগের সুর ঝরে তাই/ শিউলিতলে।'' (শরতের ধ্যান)

আলোও তো মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় কুয়াশার আড়ালে। কবি সেই বীরদের আহ্বান করেন যারা

কুয়াশা সরিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে নিয়ে আসবে : ''আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই,/ তিমিরজয়ী বীর তোরা আজ কই।/এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা/ কাহার কাছে লই।" (তপতী)

ভগবান আকাশ ভরে এত আলো জ্বালান কিন্তু তাঁকে তো দেখতে পান না কবি! সব আলোর পেছনে তিনি আছেন কিন্তু সামনে থেকে তো তাঁকে দেখা যায় না! কবির হৃদয়াকাশে যেদিন প্রেমের আলো জ্বলে ওঠে, সেই উৎসবের দিনে শ্রীভগবান সামনে আসেন। সব আলো তখন তাঁরই মুখের ওপর পড়ে, কবি চলে যান আড়ালে :

''এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে/ কী উৎসবের লগনে।/সব আলোটি কেমন করে/ফেল আমার মুখের পরে/আপনি থাক আলোর পিছনে।/প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে.../সব আলো তার কেমন করে/ পড়ে তোমার মুখের পরে/আপনি পড়ি আলোর পিছনে।" (গীতিমাল্য, ৬৬)

আলো আর আকাশ খুব প্রিয় ছিল কবির :

''আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে, সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি এবং স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার বত্রিশ সিংহাসন।" (ছিন্নপত্র, ২১৭)

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সেই বিরলতম কবিদের একজন যিনি আলো আর অন্ধকার দুয়েরই সৌন্দর্য দু-চোখ ভরে দেখেছেন। আলো কখন জ্বলবে কবির জীবনে? যখন তাঁর প্রাণের দেবতার সঙ্গে মিলন হবে। কিন্তু সেই মিলনের পথে রাতের ঘন অন্ধকার। তীব্র বিরহের যন্ত্রণা দিয়েই সেই আলো জ্বালাতে হবে। ভগবান ভক্তের জন্য অপেক্ষা করছেন—দুর্যোগের রাতে ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে যেতে হবে। বিরহের আগুনে আলো জ্বালিয়ে সেই আলো দেখে কবিকে পথ চলতে হবে :

''কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো...
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"(গীতাঞ্জলি, ১৭)

যে-আলো সুলভ সে-আলো ভগবানের নয়। অনেক যন্ত্রণায়, অনেক পথ পার হয়ে তবেই সেই আলোর দেখা মেলে।

''অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।" (গীতালি, ৯৯)

অন্ধকারেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণনাথের স্পর্শ পান যাঁকে তিনি আলোয় দেখেছিলেন। কবি যখন আলো নিভিয়ে দিয়েছিলেন তখন শ্রীভগবানই নিজের হাতে ধ্রুবতারা জ্বালিয়ে পথ দেখালেন। অন্ধকারে তাঁর আলো জ্বলে উঠল :

''অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদুচরণপাতে।...
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।"
(রাজা)

অন্ধকারে তিনি লুকিয়ে আসেন। কঠিন হাতে তিনিই আবার বুকে টেনে নেন :

''লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু,
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ।

দুঃখরথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু...।" (গীতিমাল্য, ৪৭)

তাই আলোয় নয়—অন্ধকারেই ভগবানকে আহ্বান করেন কবি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। বারবার তাঁর জীবনে মর্মান্তিক শোকের ঝড় উঠেছে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস তিনি কখনও হারাননি। উৎসবের আলো না-ই বা জ্বলল, বাঁশি না-ই বা বাজল, অন্ধকারেই তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করবেন :

"যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারেবারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।" (গীতাঞ্জলি, ৭২)

রবীন্দ্রনাথের রাজা আসেন দিনের আলোর সমারোহে নয়—গভীর অন্ধকার রাতে। 'ডাকঘরে' অমলের কাছে যখন রাজা আসবেন তখন ঘরের সব দীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়, শুধু আকাশের তারা থেকে আলো আসে। 'রাজা' নাটকে রানি সুদর্শনার সঙ্গে রাজার দেখা হয় অন্ধকারে। যতদিন রানির চোখ শুধু সুন্দরকেই খুঁজেছিল ততদিন রাজা অন্ধকারেই ছিলেন। আর যেদিন রানি বুঝতে পারলেন বাইরের সৌন্দর্য নয়—অন্তরের সৌন্দর্যই আসল সৌন্দর্য, সেদিন আর অন্ধকারের আড়ালের প্রয়োজন থাকল না। এই অন্ধকারই রাজা আর রানির মিলনের সেতু। আবার 'খেয়া'-র 'আগমন' কবিতায় রাজা আসেন গভীর রাতে। তাঁর প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন তিনি আসেন ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ সঙ্গে নিয়ে। তাই শূন্য হাতেই তাঁকে অভ্যর্থনা করতে হয় :

"তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠল ভেরী,
কে ফুকারে, 'জাগো সবাই,
আর কোরো না দেরি।'...
কোথায় আলো, কোথায় মাল্য
কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন।
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।
দু-এক জনে কহে কানে,
'বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্ত করে শূন্য ঘরে
করো অভ্যর্থন।' "

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অনন্তের রঙ তো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তার পরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর সীমার রাজ্য সেই পর্যন্ত; তার পরেই অসীম অন্ধকার।" (জাপান-যাত্রী) এই অন্ধকারই চিরকাল মানুষকে আকর্ষণ করছে। তাই চেনা জগৎ ছেড়ে সে অজানা পথে বেরিয়ে পড়ে। সে-পথে যতই বিপদ থাকুক, যতই বাধা আসুক সে গ্রাহ্য করে না। আলোর রূপ বর্ণনা করা যায়। কিন্তু অন্ধকার বর্ণনাতীত। ব্রহ্মের মতোই, অন্ধকারকেও উচ্ছিষ্ট করা যায় না।

অন্ধকারে মানুষ ছুটে যায় কেন? ওই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বাঁশি তাকে ডাকে। কবির মতে ওই অন্ধকারের বাঁশি শুনেই মানুষ যুগে যুগে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় ছুটে বেড়িয়েছে : "ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, বার বার মরতে মরতে সমুদ্রপারের পথ বের করে, বার বার মরতে মরতে আকাশপারের ডানা মেলতে থাকে।"

(জাপান-যাত্রী)

"নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন,

তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে হে রাজন।"
(পূজা, ২৩)

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন দিনের বেলা মানুষের আর রাতের বেলা দেবতার :

''কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর এ কথাই মনে হয় যে, দিনের বেলাটা মর্তলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে দেখতে চায়, এইজন্যে এতবড়ো একটা আলো জ্বালাতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এইজন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।" (জাপান-যাত্রী) সেজন্য বিজ্ঞান যখন তার আবিষ্কার দিয়ে রাতকে দিনের মতো আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে, কবির ভাল লাগেনি। তাঁর মনে হয়েছে, ''দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালি মাখালেও দেবতা তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো করে দেয় তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে।" (তদেব)

সেই অনধিকার চর্চা একান্তভাবে মানুষেরই। কালোর সঙ্গে আলোর কোনও বিরোধ নেই। অনন্ত যদি শূন্যই হতেন তাহলে জগৎ আনন্দময় হবে কী করে? জগতের যে-আনন্দযজ্ঞে কবির নিমন্ত্রণ সেখানে আলো আর অন্ধকারের সীমারেখা ঘুচে যায়। বন্ধনের মধ্যে যেমন মুক্তি সেইরকম শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতা। তাই আলো অন্ধকারের বুকে নেমে আসে আবার অন্ধকার মিলিয়ে যায় আলোর বুকে : ''সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে।" (তদেব) তাই তিনি অন্ধকারকে বন্দনা করে বলেন,

''উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদিশঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি...।"
(অন্ধকার, পূরবী)

উপনিষদ আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন ''তমসো মা জ্যোতির্গময়।" অন্ধকারের মাঝেও আলোর আভা আছে। জাপানে বিখ্যাত শিল্পী শিমোমুরার একটি ছবি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক অন্ধ সূর্যকে বন্দনা করছে। সেই ছবি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল উপনিষদের এই বাণীর রূপ যেন তিনি এতদিন পরে দেখতে পেলেন :

''শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে; প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, সাদা সাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে; বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাতজোড় করে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায়-ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা, তমসো মা জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ, আলোয় আলোময়—তারই মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।" (জাপান-যাত্রী)

এ-ছবিতে অন্ধ মানুষ অন্ধ প্রকৃতির প্রতীক। ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে যা আছে তাকে যখন আমরা অনুভব করতে পারি তখন আলো আর অন্ধকারের সীমারেখা হারিয়ে যায়। কবি যাঁকে চান তিনি তো

শুধু আলোর মধ্যেই বিরাজ করেন না, অন্ধকারের মাঝেও তিনি আছেন। তাঁর অন্ধকার অসীম তাঁর আলোর মতো। কবি তাই প্রার্থনা করছেন তাঁর মনের অন্ধকার, তাঁর জীবনদেবতার সেই অতল অন্ধকারে নিঃশেষে ডুবে যাক। তাই তিনি তাঁর 'আমি'কে; তাঁর নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিতে চান। সেই অন্ধকারে তাঁর 'আমি'র মৃত্যু হোক :

''এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী!
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে,
আমার চিত্তে এসো নামি।
এ দেহমন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা...।''
(রাজা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে বলেছেন, অন্ধকার না থাকলে আলোর কাছে আমরা বন্দি হয়ে থাকতাম। রাতই আমাদের প্রতিদিনের জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়। সে-ই প্রভুর সঙ্গে মিলন করিয়ে দেয় আমাদের : ''দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে—অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জিনিস আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।''

দিনের শেষে কর্মক্লান্ত রিক্ত কবি আসন্ন অন্ধকারের কাছেই নূতন প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন। এই অন্ধকার ভয়ানক নয়, এ আমাদের অস্তিত্বকে গ্রাস করে না। এই অন্ধকার নতুন করে বাঁচতে শেখায়, নতুন করে আলোর পিপাসা জাগিয়ে তোলে। অপরাহ্নের ম্লান আলোর মাঝে আগামী দিনের সোনালি সকালের প্রতিশ্রুতি কবির চোখে পড়ে :

''আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে দ্বার খোলো।''
(অন্ধকার, পূরবী)

দিনের আলোতে কবি যা পাননি, অন্ধকারে তা পাবেন—এই তাঁর আশা। যা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি তার বাইরেও কিছু থাকে যা ইন্দ্রিয়াতীত। আলোর ঝরনাধারায় যাকে পাওয়া যায় না, অন্ধকারে তাকে পাওয়া যায়। কবি অন্ধকারের আলোর ঐশ্বর্য থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে চান। তিনি সেখানে যেতে চান যেখানে চারদিক নিস্তব্ধ কিন্তু সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই শোনা যায় তাঁর সংগীত বিশ্বের কণ্ঠ থেকে। সেই সংগীতের স্রোত চিরকাল এই বিশ্বচরাচরের ওপরে বয়ে চলেছে। শুধু আলো নয়, সংগীতের উৎসও অন্ধকারের গর্ভে :

''দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হোক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।'' (তদেব)

আবার দিনের আলোয় নয়, রাতের অন্ধকারেই কোনও অজানা শিল্পী কবির বীণায় সুরের ঝংকার তোলেন। কবি অবাক হয়ে ভাবেন তাঁর হাতেও তো তাঁর বীণা এমন করে কখনও বাজেনি! কিন্তু তিনি কবির কাছে অধরাই থেকে যান। তাঁকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় কবি অধীর। যে-সুর তিনি শুনতে পাচ্ছেন সেই সুরের ব্যাকুলতা তাঁকে স্পর্শ করছে, অথচ তার মধ্যে যে কি বাণী লুকিয়ে আছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সে-সুর যিনি বাজাচ্ছেন তাঁকে কবি কাছে পেতে চান কিন্তু সেই অজানা

শিল্পীর দেখা তিনি পান না। শুধু সুর শুনতে পান :

''বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পূরে,
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে।'' (গীতাঞ্জলি, ৬০)

আবার আর এক অন্ধকারের কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। সে-অন্ধকার মানুষের সৃষ্টি। সে এক ভয়ানক অন্ধকার। মৃত রাক্ষসের চোখের মতো সে যেমন বীভৎস তেমনই ভয়ানক। সেই অন্ধকার রাত কখন শেষ হবে কেউ জানে না :

''রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের
চক্ষুকোটরের মত...।'' (শিশুতীর্থ, পুনশ্চ)

সেই অন্ধকারে দিশাহারা সব মানুষ 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো' ঘুরে বেড়ায়। তাদের নেতাকেও তারা বিশ্বাস করে না। তাকে মিথ্যাবাদী বলে, প্রতারক বলে। তারপরে একজন তাকে আঘাত করে, তারপরে আরও একজন, তারপরে আরও একজন। অবশেষে তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর কি আশ্চর্য তখনই বাতাসে জুঁই ফুলের গন্ধ ভেসে আসে :

''জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
মিথ্যাবাদী আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে এক সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ
তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।'' (তদেব)

এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারান না। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের মধ্যে যে-পশু আছে তাকে একদিন হার মানতেই হবে। অন্ধকার একদিন শেষ হয়ে যাবে, আবার নতুন দিনের আলো আসবে। সেই আলোয় ভরা আকাশের নিচে মা বসুন্ধরা তাঁর নবজাত শিশুকে কোলে নিয়ে দেখা দেবেন। সেই শিশুই মানুষকে এই অন্ধকার থেকে আবার আলোয় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আকাশ, বাতাস তার জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে :

''মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার,
গান উঠল আকাশে—
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের,
ওই চিরজীবিতের।'' (তদেব)